হীরালাল সেন: এক ট্র্যাজিক নায়ক

পার্থ রাহা

১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই। বোম্বাইয়ের *টাইমস অব ইন্ডিয়া* পত্রিকার নিউ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কলামে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল 'The Marvel of the century. The wonder of the world' এই শিরোনামে। তারপরে ছোটো টাইপে বিজ্ঞাপনের ভিতরের কথা: Living photographic pictures in life sized reproductions by Messers Lumier Brothers. Cinematographs. A few exhibitions will be given at Watson Hotel. Tonight. Admission one Rupee. সে যুগে এক টাকার মূল্য কিন্তু কম ছিল না। কী কী ছবি দেখানো হয়েছিল সেদিন?—তালিকা থেকে জানতে পারি: Leaving the factory, Ladies and soldiers on wheels, Arrival of a train, The Sea bath. এমনিতরো ছোটো ছোটো ছবি।

ভারতে পা দিল চলচ্চিত্র। তখনো তাকে সিনেমা বলা হচ্ছে না। বলা হল Moving Shot, চলমান ছবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। মাত্র কিছুদিন আগে চলচ্চিত্র জন্ম নিয়েছে। ঘোষিত জন্মদিন ১৮৯৫-এর ২৮ ডিসেম্বর। সরকারিভাবে প্রথম তৈরি আর প্রদর্শনের কৃতিত্ব দুইভাইয়ের। অগাস্ত আর লুই ল্যুমিয়ের। প্রথম শ্যুটিং করার কৃতিত্ব ওই দুই ভাইয়ের। ১৮৯৫-এর ৩ জুন। প্রথম শট হল ল্যুমিয়েরদের ফিল্‌ম তৈরির কারখানার গেট। শ্রমিকরা কেউ কারখানার গেট থেকে বেরোচ্ছে, কেউ বা ঢুকছে—Leaving the factory. ১৮৯৫-এর ২৮ ডিসেম্বর বিশ্বকোষের পাতায় এক ঐতিহাসিক দিন বলে চিহ্নিত। সেদিন ল্যুমিয়েরদের কিন্তু সে-কথা মনে হয়নি। মনে হলে লুই ল্যুমিয়ের সেদিন প্যারিস থেকে দূরে লিঁয়োতে বসে থাকতেন না। অগাস্ত যখন ইতিহাস তৈরি করছেন অজ্ঞাতে, লুই তখন লিঁয়োতে তাঁদের ফিল্‌ম তৈরির কারখানায়।

আমরা জানি না, কবে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে আদি কবি লিপিপূর্ব কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। কিংবা কোন জন্মদিনে পৃথিবীর প্রথম ছবি আঁকা হয়েছিল কোনো এক গুহার দেওয়ালে। জানি না কবে কোন্ আনন্দে বা বিষাদে আদি গায়ক হঠাৎ গান গেয়ে উঠেছিলেন। কোনো ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক আমাদের জানাতে পারবেন না এই শিল্প মাধ্যমগুলির জন্মদিন। কোনোদিন অনুষ্ঠিত হবে না কবিতার পাঁচ হাজারতম জন্মদিন। কিন্তু সিনেমার জন্মকথা আমরা জানি। ১৯৯৫-তে দুনিয়া জুড়ে উৎসব পালিত হল সিনেমার একশোতম জন্মদিন। জন্মলগ্ন ছিল অভিশপ্ত। জন্ম হল পুঁজিবাদের রমরমা অবস্থায়। বিকিকিনির হাটেই জন্ম হল এই মাধ্যমের। ফলে সিনেমা কোথায় পাবে আদিযুগের পূর্বপুরুষদের আকাশের সমান বিস্তৃত হৃদয়ের ছোঁয়া? শিল্প হয়ে ওঠার আগেই তার সঙ্গে পরিচয় আর এক শিল্পের যার নাম বাণিজ্য। ইংরাজিতে যাকে বলি ইন্ডাস্ট্রি।

মনে রাখা প্রয়োজন এই অসাধারণ শিল্প মাধ্যমের জন্ম কারো একক প্রচেষ্টায় হয়নি। ফরাসি যন্ত্রী এঁতিয়েন মারে ফোটোগান (photogun) নামে এক ক্যামেরা তৈরি করেন। ক্যামেরাটি ছিল রাইফেলের মতো দেখতে। ট্রিগার ছিল ক্যামেরা চালাবার বোতাম। ট্রিগার টিপলেই পর পর গুলি চালাবার মতো একসঙ্গে অনেকগুলি ছবি তোলা যেত। ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবি তোলা মারে-র ক্যামেরা দিয়ে। তারপর আর্কলাইট প্রোজেক্টারে সেই ছবি দেখানো —এই সবের ভিতর দিয়েই চলচ্চিত্রের জন্ম। যে কোনো শিল্পমাধ্যম মানুষের চিন্তা চেতনা মনীষা আর শ্রমের ফল, শ্রমের হাতিয়ার যা মানুষ তৈরি করে তার ফল। মানুষের নতুন নতুন শিল্পের আবিষ্কার করার প্রচণ্ড তৃষ্ণা এমন করেই সৃষ্টি করল আধুনিকতম শিল্পমাধ্যমকে।

ল্যুমিয়েররা আগেই জানিয়েছি কোনোদিন কল্পনাও করেননি তাদের আবিষ্কারের শিল্পমাধ্যমের কুলীন পরিবারে প্রবেশ করার কথা। তাঁদের কাছে 'মুভিং শটস' ছিল নেহাতই একটা মজা। ম্যাজিক বা সার্কাস দেখানোর মতো বাণিজ্য করার নতুন উপকরণ। কেননা চলমান বস্তু বা মানুষের ছবি দেখতে হাজার হাজার মানুষ জড়ো হত অর্থাৎ বাণিজ্য। বাণিজ্যের উপকরণ হিসেবেই জন্ম হল চলচ্চিত্রের।

ব্রিটিশ সিংহের সবচেয়ে ধনবান সম্পত্তি ভারতবর্ষ খুব পিছিয়ে রইল না। নতুন এবং মজার আবিষ্কারটি নিয়ে ল্যুমিয়ের ভাইরা বেরিয়ে পড়লেন বিশ্বজয়ে। 'চলমান ছবি'-র ভারতে এসে পৌঁছোতে লাগল ছ-মাসের কিছু বেশি দিন। আরম্ভেই জানিয়েছি বোম্বাইয়ের (অধুনা মুম্বই) ওয়াটসন হোটেলে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৭জুলাই বায়োস্কোপ দেখানো হয়। বায়োস্কোপ সেই প্রথম ভারতে আসে। প্রায় সেই সময়েই সেদিনের ভারতের রাজধানী কলকাতায় এল বায়োস্কোপ। বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারি ল্যুমিয়ের ভাইরা নয়। ল্যুমিয়ের ভাইদের ছবির প্রিন্ট (copy) নিয়ে স্টিভেন্স নামে এক সাহেব স্টার থিয়েটারে নাটক শেষ হবার পর বায়োস্কোপ দেখান। তারপর স্টার থিয়েটার যখন কোথাও নাটক দেখাতে গেছে অর্থাৎ আজকের ভাষায় 'কল শো' করতে গেছে, সেই নাটকের দলের সঙ্গে স্টিভেন্স তাঁর ভ্রাম্যমাণ প্রোজেক্টার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মফস্‌সল শহরেও বায়োস্কোপ দেখিয়েছেন। *Cinema vision* (১৯৮০) পত্রিকায় Profiles of Pioneers প্রবন্ধে বাগীশ্বর ঝা জানিয়েছেন, ১৮৯৬-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে রয়াল থিয়েটারে হাডসন নামে এক সাহেব বায়োস্কোপ দেখান। From the report appearing in the Statesman of January 20, 1897, it seems certain that the exhibition of moving pictures in Calcutta had already begun either in November or December 1896. ... Mr. Hudson had arranged for an exhibition of cinematograph in connection with his entertainments and be practi-

cally sprang a mine on this audience when he closed his performance at the Theatre Royal on Monday night with his new inventions. অবশ্য প্রবন্ধকারও স্বীকার করেছেন স্টিভেন্স, হাডসন সাহেবের আগে কলকাতায় বায়োস্কোপ দেখিয়েছেন। It is known from other authentic sources that the name that holds priority in this regard was that of Mr. Stephens who held the first screening of moving pictures...at the Star Theatre.

আমাদের এই শহর কলকাতা কিন্তু একটি বিষয়ে গর্ব অনুভব করতে পারে। যখন পৃথিবীর নানান কোণে সিনেমা শুধু সার্কাস আর ম্যাজিকের মতো নেহাতই মজার উপকরণ বলে বিবেচিত, তখন তাকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছিলেন এই কলকাতারই এক অধ্যাপক। কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ তাঁর ছাত্রদের পড়াবার সময়ে সিনেমার ব্যবহার করলেন। আকাশের তারাদের গতিপথ দেখালেন ক্লাসের ভিতর সিনেমার পর্দায়। ১৮৯৬-এর শেষভাগেই এই ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে সেদিন তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি অনুভব করেছিলেন 'চলমান ছবি' শুধু বাণিজ্য করা আর মজার খেলা দেখাবার জন্য জন্মায়নি। শিক্ষার আঙিনাতেও চলচ্চিত্রকে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা দেখতে পেলাম বাংলার জল-হাওয়া সবসময়েই ব্যতিক্রমী অনুসন্ধিৎসু।

সাধারণ বাঙালি বাবুদের কাছে সিনেমা নতুন এক আশ্চর্য মজা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কিন্তু এক বাঙালি যুবক অন্য ভাবনায় ছিলেন। তাঁর নাম হীরালাল সেন। পরে আমরা দেখব সময় তাঁকে খ্যাতির আর বিত্তের পর্বতচূড়ায় তুলেছে। আবার নামিয়ে এনেছে ধূলিমাটিতে। মলিন পৃথিবীতে। আমরা আজ প্রথম পথিককে নিয়ে কিছু কথা বলব।

১৮৬৬ সালে সেদিনের ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার বগজুরি গ্রামে হীরালাল সেনের জন্ম। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সেন সম্পর্কে তাঁর পিসতুতো ভাই। শৈশবকাল কেটেছে একসঙ্গে। দীনেশ সেন তাঁর আত্মজীবনী *ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য* গ্রন্থে লিখেছেন তিনি হীরালাল সেনের থেকে দু-বছরের বড়ো। (আমার বয়স তখন ৯ আর হীরালালের বয়স ৭)। দীনেশচন্দ্রের জন্মসাল ১৮৬৬। তাহলে হীরালালের জন্মসাল ১৮৬৮। কিন্তু কলকাতা থেকে প্রকাশিত *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* বা বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত চরিতাভিধানে হীরালালের জন্মসাল ১৮৬৬ বলা হয়েছে। যেহেতু জন্মসালের এই বিতর্ক আমাদের মূল বিষয়কে প্রভাবিত করবে না, সেই কারণে জন্মসাল বিতর্ক আমাদের এই রচনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়। শুধু বিতর্কের প্রসঙ্গটি উল্লেখ করলাম। হীরালালের পরবর্তী জীবনের উপর দীনেশচন্দ্রর প্রভাবের কথা বলতে হবে, তবে একটু

পরে। হীরালাল সেনের বাবা চন্দ্রমোহন সেন, মা বিধুমুখী। চন্দ্রমোহন সেন ঢাকা জেলা কোর্টের আইনজীবী ছিলেন। ছোটোখাটো জমিদারিও ছিল। জমিদারিতে আয় ক্রমশ কমে আসছিল। রায়তদের নানা আন্দোলনে বিরক্ত আর বিব্রত চন্দ্রমোহন বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঢাকা ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতে শুরু করেন। কলকাতায় তাঁরা থাকতেন ৮৫/২ মসজিদবাড়ি স্ট্রিট-এ। হীরালালের ঠাকুর্দা গোকুলকৃষ্ণ সেন মুনশি ছিলেন ঢাকার বিখ্যাত উকিল। আয়ও ছিল প্রচুর। হীরালালের বাবা চন্দ্রমোহনও ছিলেন সফল আইনজীবী। ফার্সি ও উর্দু ভাষাতে তাঁর ছিল সমান দক্ষতা। গোকুল মুনশির মতো না হলেও চন্দ্রমোহনের আয়ও কিছু কম ছিল না। হীরালালরা ছিলেন আট ভাইবোন। তার মধ্যে আমাদের আলোচনায় আসবে মতিলাল সেন, দেবকীলাল সেন আর বড়োদিদি হিরণপ্রভা দেবীর নাম। হিরণপ্রভা দেবী—সুন্দরী দেবী বলে পরিচিত ছিলেন। সুচিত্রা সেন এই সেন পরিবারের সঙ্গে বিবাহসূত্রে সম্পর্কিত। অবশ্য এসব কথা আমাদের আলোচনার জন্য খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়।

হীরালালের শৈশব কেটেছে সেদিনের গ্রামবাংলার অন্যান্য ছেলেদের মতোই। পুকুরে সাঁতার, মাটি দিয়ে মূর্তি গড়া, গাছে চড়ে আম, পেয়ারা বা কুল খেয়ে। আর কবিগান ও যাত্রার আসরে গান শুনে। প্রথমে মানিকগঞ্জের মাইনর স্কুলে, পরে কলকাতায় এসে কলকাতার কোনো স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু আই.এসসি. পড়া শেষ করা আর হয়নি। কেননা তখন তাঁর সমস্ত সময়টাই কাটত চলমান ছবি নিয়ে চিন্তাভাবনা আর সেই নিয়ে দৌড়াদৌড়ির মধ্য দিয়ে। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশুনোর এখানেই ইতি।

ফিরে আসছি ছেলেবেলার দিনগুলিতে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের ছেলেবেলার বেশির ভাগ সময় কেটেছে মানিকগঞ্জে, মাতুলালয়ে। প্রাথমিক পাঠও মানিকগঞ্জের মাইনর স্কুলে। হীরালাল মতিলালদের আদর্শ ছিল তখন তাদের থেকে কিছুটা বড়ো দীনেশচন্দ্র, যার দুরন্তপনার বেশ নামডাক ছিল। দীনেশচন্দ্রর মাথায় তখন নানান বুদ্ধি খেলত। একদিন কাগজ কেটে মানুষ, কুকুর, পাখি বা ঘোড়ার ছবি তৈরি করা হল। একটা বাক্সের মাঝখানে গর্ত করে বাক্সের ভিতরে কেরোসিনের সাঁঝবাতি বসানো হল। সেই আলো ছিটকে পড়ল দেওয়ালে। আর তার সামনে কাগজের মানুষ, পাখি, গাছেদের নড়াচড়া করানো হল আর দেওয়ালে অনেক বড়ো হয়ে তাদের ছায়া পড়ল। ছেলেবেলার এই ছায়া-নাটক দীনেশচন্দ্র-র কাছে নেহাতই মজার খেলা কিন্তু হীরালালের মনে গাঁথা হয়ে রইল। কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে ক্যামেরার আবিষ্কার। ভারতে ক্যামেরার প্রবেশ প্রায় তখনই। আই.এসসি. পড়ার সময়ই হীরালালের ফোটোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। তখন চন্দ্রমোহন সেন কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করার জন্য কলকাতার

৮৫/২ মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাসিন্দা। মায়ের থেকে টাকা নিয়ে হীরালালের স্টিল ক্যামেরা কেনা। ফোটোগ্রাফির চর্চা শুরু হল। একটা বেশ বড়োসড়ো নামের প্রতিষ্ঠানও করা হল। অমরাবতী ফাইন আর্ট অ্যাসোসিয়েশন। শীঘ্রই নেশা থেকে পেশা। আই.এসসি. পড়ায় ইতি। বগজুরিতে নিজের বাড়িতে স্টুডিয়ো। ১৮৯০ সালে স্টুডিয়োর নাম দিলেন H.L. Sen and Bros. স্টুডিয়ো থেকে তোলা ফোটোর পিছনে থাকত ছাপা ফুল আর পাখির ছবি। আর লেখা Photographed by Hiralal Sen & Brothers. Amarabaty, Fine Art Association, Bogjury, Manikgonj আরো আছে প্রতিটি ফোটোর পিছনে এই উদ্ধৃতি— 'Blest be the Art that Can immortalize the Art that baffles time's tyrannic aim to quench it.' কিছুদিন পরে কলকাতায় মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটের বাড়িতে স্টুডিয়ো খুলে বসেন। কলকাতায় ফোটোগ্রাফার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। ব্যবসারও ধীরে ধীরে উন্নতি হতে লাগল। মায়ের টাকাও শোধ করে দিতে পারলেন। এ-সম্বন্ধে মীজানুর রহমান ১৯৯৩-এর ১৪ এপ্রিল ঢাকার *ভোরের কাগজ*-এ একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। নাম ছিল 'উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের জনক: হীরালাল সেন'।

এমনই সময়ে স্টিভেন্স-এর কলকাতা আগমন। স্টার থিয়েটারে ছবি দেখানো। আগেই জানিয়েছি অন্য বাঙালি বাবুদের মতো হীরালাল বায়োস্কোপকে 'মজার হুল্লোড়' না ভেবে নিজের হাতিয়ার করার কথা ভাবলেন। প্রতিদিন স্টার থিয়েটারে আসেন বায়োস্কোপ দেখানোর সময়। সুযোগ পেলেই চলে আসেন স্টিভেন্স-এর ছবি দেখানোর ঘরে। স্টিভেন্স তাঁর সঙ্গে গল্পগুজব করেন, কিন্তু বায়োস্কোপ দেখানোর কৌশল কিছুতেই শেখালেন না। যন্ত্রপাতির সন্ধানও দিলেন না। হীরালাল প্রায় একলব্য শিষ্যের মতো গল্পগুজবের ফাঁকে ফাঁকেই দেখে নেন। শিখে নেন বায়োস্কোপ দেখানোর কৌশল। স্টিভেন্স যখন কোনো রকম সাহায্য করলেন না, হীরালাল নিজেই বিভিন্ন বিদেশি পত্রিকা জোগাড় করলেন। প্রোজেক্টার আর মুভি ক্যামেরার বিজ্ঞাপন দেখে কোম্পানিতে চিঠি পাঠালেন। কোম্পানিরা তাদের ক্যাটালগ পাঠিয়ে দিল। তিনি গভীরভাবে সেগুলি অধ্যয়ন করতে থাকলেন।

হঠাৎই সুযোগ এসে গেল। এক মার্কিনি ব্যবসাদার তার পুরনো প্রোজেক্টার বিক্রি করার জন্য কলকাতায় আসেন। হীরালাল কোনোক্রমে টাকা জোগাড় করে প্রোজেক্টারটি কিনে নেন। দাম পড়েছিল পাঁচ হাজার টাকা। এখানে একটা কথা না বললেই নয়। সেদিন নাটক বা বায়োস্কোপে বাঙালি বাবুরা ভিড় জমাতেন, কিন্তু এই জগৎকে দেখতেন অত্যন্ত নিচু চোখে। 'ভদ্র' সমাজে প্রায় পরিত্যাজ্য ছিল এই জগৎ। এই সময়েও হীরালাল সেনের পিতা চন্দ্রমোহন সেন কিন্তু হীরালালকে বায়োস্কোপের জগতে প্রবেশ করতে বাধা তো দিলেনই না, তাঁকে অর্থসাহায্য করে, উৎসাহিত করে নতুন ব্যবসায় উদ্যোগী

হতে বললেন। মনে রাখা প্রয়োজন, সেন পরিবার ঢাকা জেলার অতি সম্ভ্রান্ত পরিবার। ধন বা প্রতিপত্তি বা বনেদিয়ানা, কোনোটিরই অভাব ছিল না সেন পরিবারের। তবু।

প্রোজেক্টারতো জোগাড় হল। কিন্তু বায়োস্কোপ দেখানোর সুযোগ কোথায়? স্টার-এর সঙ্গে স্টিভেন্স-এর গাঁটছড়া বাঁধা। হঠাৎই সুযোগ এসে গেল। একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে। স্টিভেন্স এলাহাবাদে গিয়েছিলেন ছবি দেখাতে। স্টার থিয়েটারের সঙ্গে। সেখানে এক দুর্ঘটনায় পড়ে যান। আর তিনি বাংলায় ফিরলেন না। দেশে ফিরে গেলেন। হীরালাল এতদিন মাঝে মাঝে ময়দানে তাঁবু খাটিয়ে ছবি দেখাতেন। এবার তাঁর জায়গা হল থিয়েটার হলের ভিতরে। ভারতীয় প্রথম চলচ্চিত্রকার কে, এ-নিয়ে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, হীরালাল সেন যে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শক—এ-বিষয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। হীরালাল সেনই প্রথম ভারতীয় যিনি প্রোজেক্টার দিয়ে ছবি দেখান। সময়টা ১৮৯৭-৯৮ সাল। বিশ শতক শুরু হবার আগেই।

তখন শহরে হাওড়া ব্রিজ আর রাজভবন ছাড়া আর কোথাও বিদ্যুতের ব্যবস্থা ছিল না। ছবি দেখাতে হত আর্কলাইট প্রোজেক্টারে। গ্যাস দিয়ে আলোর ব্যবস্থা। অক্সিজেন ভরা থাকত একটা রবারের ব্যাগে। ভিস্তিওয়ালাদের চামড়ার বস্তার মতো। একদিন ব্যাগ গেল ছিঁড়ে। অক্সিজেন গেল উড়ে। অক্সিজেন না থাকলে আলো জ্বলবে না। ছবিও দেখানো যাবে না। হীরালাল সেনের সেদিনের একমাত্র আর অকৃত্রিম শিক্ষক ছিলেন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ফাদার লাফোঁ (Father Laffoun)। তাঁর কথা আগেই বলেছি। ফাদার প্রাথমিকভাবে ব্যাগ মেরামত করে দিলেন কিন্তু বোঝালেন রবারের ব্যাগের বিকল্প প্রয়োজন। দুজনে মিলে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে স্টিলের ট্রাঙ্ক তৈরি করলেন, এখন আর হঠাৎ বিপদের ভয় নেই। প্রথমদিকে হীরালাল আর ভাই মতিলাল সেন ছবি দেখাতেন। কোনো কোম্পানি গড়ে ওঠেনি। ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটার প্রথম তাঁদের প্রথম থিয়েটার হলে ছবি দেখাল। সাধারণের মুখে মুখে তখন সেন ব্রাদার্স। ১৮৯৮ সালের শেষদিকে তাঁরা কোম্পানি তৈরি করলেন। রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি। কোম্পানিতে যোগ দিলেন তাঁর ছোটোভাই দেবকীলাল আর তাঁর ভাগনে কুমারশঙ্কর গুপ্ত। অবশ্য দেবকীলাল কিছুদিন পরে সরকারি চাকরি নিয়ে কোম্পানি ছেড়ে দিলেন। হীরালাল দেখতেন প্রযুক্তির দিক। ব্যবসার আর্থিক দিকটা দেখতেন ভাই মতিলাল। আর কুমারশঙ্কর ছবি দেখানোর কাজে দক্ষ হয়ে উঠলেন। কুমারশঙ্কর গুপ্তকে প্রথম ভারতীয় অপারেটার বলতে পারি। কোম্পানি গড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নানান কোণ থেকে ডাক আসতে লাগল। বাংলা, বিহার, ওড়িশার রাজা আর জমিদাররা রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানির খরিদ্দার হয়ে গেলেন। তাদের নানান উৎসবে হীরালালদের ছবি দেখানোর ডাক পড়ল। আর শুধু ক্লাসিক-এ না, স্টার, ন্যাশনাল, মিনার্ভাতেও ছবি দেখাতে শুরু করে প্রভূতউপার্জন করল রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি।

কিন্তু শুধু ছবি দেখিয়ে মন ভরল না হীরালালের। তিনি নতুন কিছু করতে চান। তিনি তো জন্মেই ছিলেন ইতিহাস তৈরি করার জন্য। শোনা যায় সাহসীদেরই ভাগ্য সুযোগ করে দেয়। ১৯০০ সালে ফ্রান্সের প্যাথে কোম্পানি এল ভারতে। ভারতের কিছু শহরের ছবি তোলার জন্য। ক্যামেরা নিয়ে এই শহর কলকাতাতেও। তখন ভারতের রাজধানী কলকাতা। বড়োলাটের শহর। হীরালাল এই সুযোগে তাঁদের দলে যোগ দিলেন। স্থিরচিত্রে (Still Photography) তিনি আগেই দক্ষ ছিলেন। তাই চলমান ছবি তোলা শিখতে খুব বেশি বেগ পেতে হল না। কার্যসিদ্ধি হলে বিলিতি দল ছেড়ে দিলেন। এদিকে ভারত ছেড়ে যাবার আগে প্যাথে কোম্পানি কয়েকটা ক্যামেরা খুব কম দামে বিক্রি করে গেল। তারই একটা নিয়ে তিনি নতুন অভিযানে নামলেন।

থিয়েটারে হলে বায়োস্কোপ দেখাবার জন্য অনেক নট নাট্যকারের সঙ্গে পরিচয় ছিল হীরালালের। তিনি নাটকের দৃশ্যের ছবি তোলার জন্য গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখরের কাছে গেলেন। তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন। কিন্তু কেউই রাজি হলেন না। আসলে গিরিশচন্দ্র সেদিনের এই নতুন মাধ্যমটিকে 'নিচু স্তরের মজা' ছাড়া ভাবতেই পারেননি। আর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অমৃতলাল বায়োস্কোপকে নাটকে ভবিষ্যৎ প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছিলেন। ফলে তাঁরা কেউই এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না, হলে হয়তো আমরা গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বা অর্ধেন্দুশেখরের মঞ্চ প্রতিভাকে দেখতে পেতাম। হয়তো!

কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সে যুগের সবচেয়ে নতুন চিন্তার প্রবর্তক। নট ও নাট্য পরিচালক। সেসময় বঙ্কিমচন্দ্রের *সীতারাম*-এর নাট্যরূপে জীবন্ত ঘোড়াকে মঞ্চে এনে বাঙালি দর্শকদের চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন অমরেন্দ্রনাথ। তখন ক্লাসিক থিয়েটার আর অমরেন্দ্রনাথের শহরজোড়া নামডাক।

অমরেন্দ্রনাথ আর হীরালাল এই ক-বছরের মধ্যেই বুঝেছিলেন ল্যুমিয়েরদের মতো শুধু মুভিং শটস বা চলমান ছবি দেখিয়ে দর্শকদের আর আকর্ষণ করা যাবে না। কাহিনিহীন চলমান ছবি তাৎক্ষণিক মজা দিয়েছিল ম্যাজিকের মতো। কিন্তু সেই ঐন্দ্রজালিক মোহ কেটে গেলে মজাও শূন্যে বিলীন হয়ে যাবে। চাই কাহিনিভিত্তিক চলমান ছবি। শুরু হল নতুন পরীক্ষা।

সেদিনের পশ্চিমি সংস্কৃতির আবহাওয়ায় লালিত অমরেন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সিনেমার ভবিষ্যৎ শক্তির কথা। মঞ্চের নাটককে ক্যামেরায় তুলে নিলেন। নাটকটি হল সেদিনের মঞ্চসফল নাটক *ভ্রমর*। বঙ্কিমচন্দ্রের *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর নাট্যরূপ। কেননা নাটকটিতে *কৃষ্ণকান্তের উইল*-এর অন্যতম নায়িকা ভ্রমরকে মুখ্য চরিত্র করা হয়েছিল। হীরালাল সেন এই নাটকের অংশ চলচ্চিত্রায়িত করেছিলেন। ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারির *অমৃতবাজার পত্রিকা* থেকে জানতে পারি এই খণ্ড-চলচ্চিত্রের কথা। ১৯০১ সালে

*আলিবাবা*নাটকের কিছু দৃশ্য হীরালাল সেন মুভি ক্যামেরায় ধরে রাখেন। ১৯০১ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ *ভ্রমর*-এর বিজ্ঞাপনের সঙ্গেই একটি সংবাদ প্রকাশিত হয় : '*আলিবাবা* ছবির একটি দৃশ্য এখানে তুলে ধরছি। দূরের পাহাড় দেখা গেল। দূরের পাহাড় কাছে এল, পাহাড়ের একদিকে গুহার মুখে দরজা দেখা গেল। দস্যুরা এক এক করে বেরল। আলিবাবা দূর থেকে দেখছিল দস্যুরা চলে গেল। সে কাছে এল। কী যেন বললো। দরজা খুলে গেল। আলিবাবা গুহার ভিতরে প্রবেশ করল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। পর্দা কালো হয়ে গেল।' এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাচ্ছে হীরালাল ক্যামেরা চালনায় অতি দক্ষ ছিলেন। সে যুগে মার্কিন বা ব্রিটিশ চলচ্চিত্রেও লং শট, ক্লোজ শট, প্যানিং-এর ব্যবহার খুব বেশি দেখা যায়নি।

১৯০৩ সালে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি তার চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবসা ক্লাসিক থিয়েটারের আঙিনা ছেড়ে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করে। ১৮৯৯ সালে মিনার্ভা হল তিনদিন ভাড়া করে সেখানে কেবলমাত্র বায়োস্কোপ দেখান। ১৯০০ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে সেদিনের বহু রাজা মহারাজের, মুৎসুদ্দিদের ছবি দেখান। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশে বায়োস্কোপ প্রদর্শন করে বিপুল সম্মান পান। জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এবং অবশ্যই অর্থ। অনুপম হায়াৎ তাঁর *বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস* বইতে জানিয়েছেন সেন ভ্রাতৃদ্বয়ের রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি, প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, মহারাজা যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্যার আশুতোষ মুখার্জির বাড়িতে ছবি দেখিয়েছে। গবেষক মুনতাসির মামুন-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করে হায়াৎ জানিয়েছেন ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি ছবির প্রদর্শনী করে।

১৯০৩ সালে আর পুরনো সেকেন্ডহ্যান্ড ক্যামেরা নয়। বিলেতের ক্যাটালগ দেখে, ফাদার লাফোঁর পরামর্শ নিয়ে হীরালাল নতুন ক্যামেরা কিনলেন। এবার *আলিবাবা* পুরো নাটকটিই ক্যামেরাবন্দি করা হল। আলিবাবা-মর্জিনার নাচের দৃশ্যটি অত্যন্ত মুনশিয়ানার সঙ্গে তোলা হয়েছিল। আবদাল্লার ভূমিকায় ছিলেন নৃপেন বসু আর মর্জিনার ভূমিকায় বিখ্যাত অভিনেত্রী কুসুমকুমারী।

অমৃতবাজার পত্রিকা-র ১৯০১-এর ফেব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনে *সরলা*-র কথাও উল্লেখ করা আছে। ১৯০০ সালে সরলার দৃশ্যাংশ নির্মিত হয়। ১৯০০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত হীরালাল যে নাটকগুলির পূর্ণ বা দৃশ্যাংশ ক্যামেরায় ধরে রাখেন সেগুলি হল, *ভ্রমর, আলিবাবা, হরিরাজ, দোললীলা, সরলা, বুদ্ধ, সীতারাম, দুটি প্রাণ, মৃণালিনী, সোনার স্বপন, মনের মতন, মজা, বধূ, চাবুক, গুপ্তকথা, ফটিক জল, ললিতা ফনিনী* — হয়তো আরো কিছু নাটকের দৃশ্য। সংবাদচিত্র বা আজকের ভাষায় '*নিউজ ম্যাগাজিন*' তোলার ক্ষেত্রেও 'রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি' ছিল অগ্রদূত। সেই ১৯০৩ সালেই দিল্লির করোনেশান

দরবারের ছবি তোলেন হীরালাল, কলকাতার করোনেশন দরবারের চলচ্চিত্রও তোলেন হীরালাল (১৯০৩)। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পুলিশের লাঠিচার্জ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিল (১৯০৫), এসব ঐতিহাসিক ঘটনাও ধরা পড়েছে হীরালালের ক্যামেরায়। এরও আগে তোলা 'পথের দৃশ্য', চিৎপুর রোডের চলমান দৃশ্য। তাঁর নিজের বগজুরি গ্রামের বিবাহ উৎসব, রাজেন মল্লিকের বাড়ির বিবাহ উৎসব, আরো নানান রাজা জমিদারদের বাড়ির উৎসবের ছবি তোলেন হীরালাল। এসবই তোলেন ১৯০০ থেকে ১৯০২-এর মধ্যে। এডুইন পোর্টার-এর 'গ্রেট ট্রেন রবারি'-র আগেই। আর বিজ্ঞাপনচিত্র অর্থাৎ আজকের 'অ্যাড ফিল্ম্'-এর ভারতীয় পথিকৃৎ হীরালাল সেন। তাঁর জবাকুসুম তেল বা সালসা পিলার বিজ্ঞাপনচিত্র (১৯০৩) সেদিন শুধু জনপ্রিয় ছিল তাই নয়। কোম্পানির উৎপাদনের পারদও বাড়িয়ে দিয়েছিল অনেকগুণ। সরকারি ম্যালেরিয়া প্রতিষেধক 'কুইনাইন'-এর প্রচারচিত্র তোলার কৃতিত্বও হীরালালের। ১৯০৩ সালেই। হারিয়ে যাওয়া ছবির খবর পাই সেদিনের পত্রপত্রিকা থেকে। ১৯০০ সালের ৮ ডিসেম্বর *The Bengalee* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছিল : 'The Classic Theatre is exhibiting war pictures through the modern invention of the Bioscope, which as could be easily imagined has added to the attractions of popular house of amusements'. ১৯০১-এর ৯ ফেব্রুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটারের হ্যান্ডবিলে লেখা : BIOSCOPE: series of supreme pictures from our world renowned play Bhramar, Alibaba, Sitaram.' ... ১৯০৩ সালের ২১ আগস্ট *বঙ্গবাসী*-র বিজ্ঞাপন: 'আসুন। দেখুন। যাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তাহাই সম্ভব হইয়াছে। ছবির মানুষ জীবন্ত প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বায়োস্কোপ দেখুন।

'প্রকৃতই রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রশংসার যোগ্য। ইহারা বায়োস্কোপ অর্থাৎ অদ্ভুত ও প্রসিদ্ধ ঘটনাবলীও চলন্তভাবে চিত্রপ্রদর্শন করিয়া ভারতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহারা যে কেবল বিলাতি ছবি দেখাইয়া থাকেন, তাহা নহে। ইহারা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কলকাতার অনেক চলন্ত দৃশ্যের ফোটো তুলিয়াছেন।'

বিজ্ঞাপনগুলি প্রমাণ করে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি ভারতে চলচ্চিত্র প্রদর্শক হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর তারা নিজেরাও বহু ছোটো ছোটো ছবি তৈরি করেছেন। আর একটি বিষয়ও প্রমাণ করে, সিনেমা তখনো শিল্প মাধ্যম নয়—অষ্টম আশ্চর্য, অর্থাৎ ম্যাজিক মাত্র।

হীরালাল সেন যে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শক, সে বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। গত শতাব্দী শুরু হওয়ার আগেই, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই তিনি ময়দানে

তাঁবু খাটিয়ে থিয়েটার হলে হলে, রাজা জমিদারদের বাড়িতে বাড়িতে ছবি দেখিয়ে চলেছেন। ম্যাডান, ছবি দেখানোর ব্যবসায় আসেন ১৯০২ সালে। শতাব্দীর প্রথমে তিনি মদের ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

কিন্তু প্রথম সিনেমার ছবি তোলার ক্ষেত্রে তাঁর পিতৃত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। সেদিনের কিছু পত্রপত্রিকা থেকে জানা যায় ১৮৯৭ সালে বোম্বাইয়ের এইচ.এল.ভটওয়াদেকার (H.L. Bhatwadeker) মুভি ক্যামেরা দিয়ে একটি ঝুলন্ত ব্রিজের উপর মল্লযুদ্ধের ছবি তোলেন। সসারাম নামে আর এক যুবকের কথা শোনা যায় যিনি ১৮৯৮-৯৯ সালে চলমান ছবি তুলেছিলেন। ভটওয়াদেকারের উল্লেখ ওই মল্লযুদ্ধ বা প্রথম ভারতীয় র‍্যাংলার আর.পি.পরাঞ্জপের সংবর্ধনা সভার ছবি ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। আর সসারামের প্রচেষ্টা ছিল একেবারেই বিচ্ছিন্ন আর বিক্ষিপ্ত। হীরালাল সেন-এর মতো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কোম্পানি তৈরি করে সিনেমা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করেননি। এবার পাঠকরাই বিচার করতে পারবেন প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকারের মর্যাদার মুকুট কার মাথায় পরাবেন।

সংবাদচিত্র আর বিজ্ঞাপনচিত্র-র ক্ষেত্রে হীরালাল কিন্তু তর্কাতীতভাবেই প্রথম ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। ভারতের জিগা ভের্তব। সেই সম্মান কি তাঁর প্রাপ্য নয়? ইতিহাস কি তাঁকে সেই সম্মান দিয়েছে?

আলিবাবা-র খণ্ডদৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন হীরালাল ১৯০১ সালে। আবদাল্লা ও মর্জিনার নৃত্যদৃশ্য গ্রহণ করা হয় নতুন ক্যামেরা আনার পর ১৯০৩ সালে। আবদাল্লার ভূমিকায় অভিনয় করেন নৃপেন বসু। আর মর্জিনার ভূমিকায় সেদিনের খ্যাতনামা মঞ্চাভিনেত্রী কুসুমকুমারী। হুসেনের চরিত্রে অভিনয় করেন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বয়ং। নৃপেন বসু আর কুসুমকুমারীই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা অভিনেত্রী। অবশ্য সিনেমার শ্যুটিং-এর মতো 'শট' ভাগ করে, পছন্দ না হলে বারবার একই 'শট' ক্যামেরাবন্দি করে, টুকরো শটকে সম্পাদনার টেবিলে এনে কাটাছেঁড়া করে সম্পূর্ণ সিনেমা যেমনভাবে হয়, তেমন করে তোলা হয়নি। নাটক চলাকালীন দর্শক আসনের মাঝখানে ক্যামেরা বসিয়ে সম্পূর্ণ নাটকটি ক্যামেরাবন্দি করা হয়। যদি একে পূর্ণাঙ্গ কাহিনিচিত্রের মর্যাদা দেওয়া হয়, তবে *আলিবাবা*-ই হবে প্রথম কাহিনিচিত্র। আর প্রথম চলচ্চিত্রকারের মর্যাদা পাওয়া উচিত হীরালাল সেনের। প্রথম ভারতীয় কাহিনিচিত্র হিসাবে স্বীকৃত ছবি *রাজা হরিশ্চন্দ্র* তৈরি হয় ১৯১২ সালে। কেন হীরালাল সেনের 'থিয়েটারস্কোপ'কে যথোচিত সম্মান দেওয়া হবে না? ১৯০৩-এ মার্কিনি বা বিলিতি ছবি কি এই জাতীয় থিয়েটারস্কোপ থেকে উন্নততর ছিল? বোধহয় না—তবু কেন হীরালাল সেনের প্রতি এই অবজ্ঞা?

হীরালাল সেন খণ্ডদৃশ্য, নাটকের দৃশ্য, সংবাদচিত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র নিয়ে কমবেশি ৪০টি ছবি তুলেছিলেন। ১৯০৩-০৪, এই সময়কাল রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানির স্বর্ণযুগ। খ্যাতি, অর্থ সবই হীরালালের করায়ত্ত। ১৯০৫ সাল থেকে রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানির ব্যবসায় মন্দার চিহ্ন দেখা দিতে শুরু হল। ফ্রামজি জামসেদজি ম্যাডান চলচ্চিত্রের ব্যবসায় নামলেন প্রচুর মূলধন নিয়ে। হীরালালের স্রষ্টার প্রতিভা ছিল, কিন্তু বাণিজ্য-দূরদর্শিতা ছিল না। প্রচুর অর্থলাভ করেও শুধুমাত্র সিনেমা দেখানোর স্থায়ী জায়গার কথা ভাবতে পারেননি। তাঁর ছবি দেখানোর জন্য থিয়েটার, হোটেল, জমিদার বা মুৎসুদ্দিদের উপর নির্ভর করতে হত। ম্যাডান প্রথমেই শুধুমাত্র সিনেমা দেখানোর ছবিঘর তৈরি করে ছবি দেখানো শুরু করলেন। সেখানে শুধু কিছু খণ্ডদৃশ্য নয়, মার্কিন বা ইংল্যান্ড থেকে কাহিনিচিত্র এনে দেখাতে শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরো কয়েকটি সিনেমা দেখানোর কোম্পানিও তৈরি হয়ে গেল। রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি প্রচণ্ড প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হল। আর অমরেন্দ্রনাথ দেখলেন দর্শকরা থিয়েটারের খণ্ডদৃশ্য দেখতে আর ভিড় জমায় না। হয় তারা ম্যাডানের সিনেমা হৌসে বায়োস্কোপ দ্যাখে, না হয় থিয়েটার হলে গিরিশ, অমৃতলাল বা অমরেন্দ্রনাথ, আঙুরবালা, কুসুমকুমারীদের দেখতে যায়। ফলে অমরেন্দ্রনাথ নাটকের ছবি তোলা বা থিয়েটারের সঙ্গে 'বায়োস্কোপ' দেখানো বন্ধ করে দিলেন। আর এসময়ের হীরালাল সেন সম্পর্কে তাঁর পিসতুতো ভাই বাংলার পণ্ডিতকুলের অগ্রগণ্য ড. দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন: 'একদা তাঁহার চরিত্র তুষার শুভ্র ছিল, কিন্তু কলিকাতার থিয়েটারের পাল্লায় পড়িয়া নটরাজ বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সেই হীরালাল যেরূপ দুর্গতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা তদ্রূপ কুসংসর্গের পরিণামের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।' (*ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য* পৃ. ৫৮-৫৯) হীরালালের বেহিসেবি জীবনের জন্য পারিবারিক অশান্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ব্যবসার অধোমুখীনতার জন্য দায়ী তাঁর দূরদৃষ্টি আর পরিকল্পনার অভাব। রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি ১৯০০ থেকে ১৯০৩-৪ পর্যন্ত যে পরিমাণ লাভ করেছিল, সেই লভ্যাংশ থেকে একটি স্থায়ী সিনেমা দেখানোর 'হল' তৈরি করা যেত। নতুন নতুন কলাকৌশলে সেদিনের বহু ঘটনা বা কাহিনিকে ক্যামেরাবন্দি করা যেত। কিন্তু প্রথম স্থায়ী সাফল্যের ঘেরাটোপেই বন্দি ছিলেন হীরালাল। দেখা গেল ১৯০৮/৯-এর মধ্যেই ম্যাডান, ছবি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একচেটিয়া বাজার দখল করে নিল। এদিকে থিয়েটার হলে বায়োস্কোপ দেখানো বন্ধ হয়ে গেল। অমরেন্দ্রনাথ আর নাটকের দৃশ্যাংশ তোলায় উৎসাহী হলেন না। অপরদিকে আর এক উদ্যোগী বাঙালি অনাদিনাথ বসু স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায় স্টুডিয়ো কোম্পানি খুললেন, কোনো জমিদার বা থিয়েটার মালিকের উপর নির্ভর না করে। সুতরাং রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানির অনেক পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েও (১৯০২) ছবি তৈরির ক্ষেত্রে অনেক

এগিয়ে গেল। পরবর্তীকালে আমরা দেখব ব্রিটিশ সরকার তার সৈন্যদের ছবি দেখাবার জন্য দেশজোড়া টেন্ডার ডাকেন। দেশের আর সব ফিল্‌ম কোম্পানি এমনকী ম্যাডানকেও টেক্কা দিয়ে অরোরা এই টেন্ডারটি জিতে নেয়। অপরদিকে অরোরা সাধারণ মানুষের মন জয় করে নেয় বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিছিলের ছবি, রবীন্দ্রনাথের রাখি পরানোর দৃশ্য তুলে এবং দেখিয়ে। রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে লাগল। কোম্পানির খারাপ সময়ে যা হবার তাই হল। শুরু হল ভ্রাতৃবিবাদ। ছোটোভাই দেবকীলাল অনেক আগেই প্রশাসনের বড়ো চাকরি পেয়ে 'কোম্পানি' ছেড়ে চলে যান। মতিলাল সেন ব্যবসার আর্থিক বিষয়টি দেখতেন। তিনি বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে বেরিয়ে যান। ভাগনে কুমারশংকর গুপ্ত যিনি ছিলেন তাঁর প্রধান অপারেটার তিনিও কোম্পানি ছেড়ে দিয়ে অন্য বেশি লাভজনক কোম্পানিতে যোগ দিলেন। রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানি ভেঙে গেল। বন্ধই হয়ে গেল ১৯১২ সালে। বাংলার—ভারতের চলচ্চিত্রের প্রথম পথপ্রদর্শক হীরালাল সেন লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানির সাধারণ কর্মচারীতে রূপান্তরিত হলেন। সেখানেও বেশিদিন স্থিত হতে পারলেন না। শেষ চেষ্টা করলেন আজকের গণেশ টকিজের কাছে এক মুৎসুদ্দি রাম দত্ত-র সঙ্গে যৌথভাবে একটি সিনেমা হল তৈরি করে। নাম দিলেন 'শো হাউস'। এই 'শো হাউস'-এর পিছনে শেষ সঞ্চিত অর্থ ঢাললেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল, রাম দত্ত 'শো হাউস'-টির মালিকানা তাঁর নিজের নামে করে নিয়েছেন। কোথাও হীরালালের অংশীদারিত্ব নেই। কপর্দকশূন্য হীরালাল তাঁর সাধের মার্কিনি ওয়ারউইক অ্যান্ড সন্স-এর প্রোজেক্টার, তাঁর জার্মানি থেকে আনা ক্যামেরা, এমনকী তাঁর আংটিও বিক্রি করে দেন। ১৯১৭-য় অনারোগ্য কর্কট রোগে সব কিছু হারিয়ে যাওয়া গ্রিক ট্র্যাজেডির নায়ক হীরালাল সেন-এর মৃত্যু। সিদ্ধার্থ কাক সম্পাদিত *Cinema Vision* Vol.1, No.1-এ হীরালালকে শেষজীবনে 'completely helpless' বলা হয়। 'Continuously deteriorating condition of his benefactors, and finally betrayed by his brother and friends, which almost rendered Hiralal Sen completly helpless. Even his health failed him. Afflicted with Cancer, he died in 1917.'

কপর্দকশূন্য অবস্থায় হীরালালের মৃত্যু। তাঁর আজীবন সঙ্গিনী স্ত্রী হেমাঙ্গিনী দেবী আর ছেলে বৈদ্যনাথ আর মেয়ে প্রতিভাকে সারাজীবন দেখাশোনা করেন, আশ্রয় দেন তাঁর ছোটোভাই দেবকীলাল।

যে ক্যামেরা হীরালালের কাছে শেষদিকে অব্যবহৃত হয়ে পড়েছিল সেটি অরোরার অনাদিনাথ বসু সংগ্রহ করে পরবর্তীকালে অরোরার বিজয়রথের সওয়ার হন।

দুর্যোগ যখন আসে, তখন একা আসে না। মতিলাল সেন থাকতেন কলকাতার রায় বাগানে। তাঁর বাড়িতেই রয়াল বায়োস্কোপ কোম্পানির ফিল্‌ম, কাগজপত্র সব কিছুই থাকত। এক ভয়াবহ আগুনে মতিলালের বড়ো মেয়ে অমিয়বালা মারা যান, আর আগুনে ছাই হয়ে যায় হীরালালের সমস্ত সৃষ্টি— সব সাক্ষী নথিপত্র।

হীরালাল বেঁচে আছেন কিছু প্রাচীন মানুষের মুখের কথায়। আর বেঁচে আছেন কিছু হলুদ হওয়া হ্যান্ডবিলে। আমরা আজও দাদাসাহেব ফালকের *রাজা হরিশচন্দ্র* দেখতে পাই, এমনকি তার নির্মাণকর্মের ছবিও। ফালকের মাথায় ভারতের প্রথম চলচ্চিত্রকারের শিরোপা। এদেশের চলচ্চিত্রের সর্বোচ্চ সম্মান তাঁর নামে। আজ কেই-বা জানে হীরালাল সেনের নাম? কয়েকজন পুঁথিঘাঁটা গ্রন্থকীট গবেষক ছাড়া। আমাদের এই সাধের দেশের কর্তাব্যক্তিরা ভারতীয় সিনেমার বিউগল-দামামা-বাদ্যি বাজানো একশো বছরের জন্মদিনেও মনে করতে পারেননি সেই দুঃসাহসী অভিযাত্রী, বিপর্যয় বিড়ম্বিত মানুষটির কথা। খাণ্ডবদাহনের মতো আগুন তার সবকিছুই গ্রাস করেছিল। তাঁর অতীতকে, তাঁর ভবিষ্যৎকেও।

ঢাকার মানুষ ছিলেন হীরালাল সেন। ভারতে নয়, বাংলায় নয়, তাঁর কাজের শহর কলকাতায় নয়। ঢাকার একটি মনোরম রাস্তা হীরালাল সেনের নামাঙ্কিত। ভারতবর্ষ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা ভুলে গেলেও বাংলাদেশ ভোলেনি চলমান ছবির প্রথম ভারতীয় জাদুকরকে।

আত্মবিস্মৃত বাঙালি কি নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়ে একবার স্মরণ করবে না এক ভাগ্যপীড়িত অবজ্ঞাত ট্র্যাজিক নায়ককে?